Website: https://www.parthasarathipatrika.com

২৩ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১১ই ফাল্গুন, ১৪২৮ / 24.02.2022

-: সম্পাদক:-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
আনন্দ-ভগবান	শ্রীঅরবিন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ–সহচর হৃদয়রাম	শ্রী সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
দশাবতারে বিবর্তনবাদের ইঙ্গিত	স্বামী শিবানন্দ গিরি
অভিনয়	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by
Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website: https://www.parthasarathipatrika.com
Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

(10.03.1926 - 24.11.1986)

প্রীতি কণা

"আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো ধর্ম, সেবা ও ত্যাগ। সেবা হবে প্রেম ও শ্রদ্ধার সাথে। ধর্ম-জীবন ও সেবা – এই দুটি দিয়ে গড়ে তুলতে হবে প্রথমে নিজের জীবন, তারপর নিজ নিজ সংসার, গোষ্ঠী ও সমাজ, দেশ। নিজের জীবনকে প্রথমে পবিত্র ও শুদ্ধ সেই সঙ্গে প্রেমময় করে তুলতে হবে।"

DO NOT COPY

(15.10.1936 – 24.10.2019)

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

বাংলা ১৩৯৫ সন খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল। দুঃখের দিন যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই ভালো।

আমার সবচেয়ে মজা লাগে "পার্থসারথি" প্রকাশের পর। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে যা মনে পড়ে তাই লিখে যাই, ফলে কোনও কোনও প্রিয়জনের আঁতে ঘা লেগে যায় – তাঁরা আবার আমার সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ফলে পরবর্তী সংখ্যায় লেখার আগে আবার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়।

যারা আমার সমালোচনা করেন, তারা ভাবেন না বিগত দিনে তিরিশ বছর একসাথে থেকে শ্রী প্রীতিকুমারের সাথে আমার কথোপকথনে অন্ততঃ ৩০ x ৩৬৫ x ১০০০ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ তখন দিনে আমি কম করে একহাজার কথা বলতাম। সেই দৈনিক একহাজার শব্দের মধ্যে কারও না কারও সম্বন্ধে একটি বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। সেই জন্য আমার stock-এ অনেকের সম্বন্ধেই শ্রীপ্রীতিকুমার বর্ণিত বাক্য মজুত আছে। আমি বলছি না, মানে এই নয় যে আমি জানি না বা শুনিনি। যাঁরা যাঁরা আমাদের জীবনে এসেছেন তাঁদের সবার সম্বন্ধেই শ্রীপ্রীতিকুমার কিছু না কিছু বলেছেন যেগুলি স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে আমার তো মনে পড়বেই ।

DO NOT COPY

কয়েকদিন আগে ডাঃ রুহিদাস সাহা এসেছিলেন। তিনি তো আমার লেখায় উৎসাহ দিলেন। আমি লেখিকা নই, সাহিত্য রচনা আমার পেশা নয়। বিগত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরে শ্রী প্রীতিকুমারের যে সান্নিধ্য আমি পেয়েছি সেটাই শুধু স্মরণ করতে চাই। আর তার ফলেই কলমের আগায় বিভিন্ন প্রিয়জনের পরিচিতজনের নাম এসে পড়ে।

কাউকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেমন কেমন ধরণের লোকেরা শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে আসতেন সেটাই স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়ে।

এরমধ্যে ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীও এসেছিলেন আমাদের দেখতে। তিনি আমাকে লেখায় উৎসাহিত করেছেন প্রথম থেকেই। আমাদের কাছে তাঁর কোন ঋণ নেই, তবু এই বৃদ্ধ বয়সে পাইকপাড়া থেকে এসে আমাদের দেখে গেলেন – আমাকে পড়াশুনা করবার উৎসাহ দিয়ে গেলেন। শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে তাঁর খুব শ্রদ্ধাপূর্ণ ও মধুর সম্পর্ক ছিল। তিনি কিন্তু সেটি স্মরণে রেখেছেন। আমারই তাঁকে দেখতে যাওয়া উচিত। কিন্তু মানসিক অবস্থার জন্য আমি আর কোথাও যাইনা। তাছাড়া এই আড়াই বছরে একটি শিক্ষা হয়েছে, যার বাড়িতে যাব তাঁর ব্যবহারটার উপর আমার যাওয়া আসা নির্ভর করে। তিনি মুখে কিছু না বললেও আমাকে তাঁর Reception-এর বহর দেখে বুঝে নিতে হবে আমার যাওয়া উচিত বা অনুচিত। তাই অত চিন্তা ভাবনার কি দরকার – গেলামই না কোথাও।

অনেকে মনে করেন আমাকে অনেক সাহায্য করছেন – গৌরব বোধ করে বলেও ফেলেন, আমার হাসি পায় ...

পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী।।

কেউ যদি তাঁর মতো করে মনে করেন, আমি নিরুপায়। আমি তো সেই ১৯৫৬ সন থেকে শ্রীপ্রীতিকুমারের সঙ্গে সঙ্গে আছি। কে কতবার এসেছেন আমার থেকে কেউ বেশি জানে না। কার কি আর্জি ছিল, কে কতবার লটারীর টিকিট কেটে টাকা পেতে চেয়েছেন তার কিছুটা আমার নজরে পড়েছে। যদি এ ঘটনাগুলি বাড়িতে না ঘটে শ্যামবাজারে ঘটতো, মেজাজ খুব ভালো থাকলে এবং গোপনীয়তার ব্যাপার না থাকলে শ্রীপ্রীতিকুমার রাত্রে খাবার সময়ে রসিয়ে রসিয়ে সেসব কথা শোনাতেন। রাত্রে সবাই মিলে একসাথে খাওয়াটা তাঁর

নিয়মের মধ্যে ছিল। আমরা সাগ্রহে তাঁর বাড়িতে ফেরবার অপেক্ষা করতাম .....

যাঁরা শ্রী প্রীতিকুমারের কাছে আসতেন তাঁরা কেউই মূর্খ ছিলেন না। তাঁদের বিচার বুদ্ধি, শিক্ষা সামর্থ্য ছিল। তাঁরা এতগুলি বছর তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন কি কিছু না পেয়েই? কি করে? শ্রীপ্রীতিকুমারের তো নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি নজর ছিল না। আজ নার্সিং হোমে কার অপারেশান - যেতে হবে। কাল কার ছেলের পরীক্ষা - যেতে হবে। পরশু কার মেয়ের আশীর্বাদ – গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাছাড়া পরীক্ষার সময় টেলিফোন ধরা আমার একটা নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছিলো। অনেক সময় অনেক উদ্ভট আবদারে অতিষ্ঠ শ্রীপ্রীতিকুমারই আমাকে শিখিয়ে দিতেন – "বল, বাড়ি নেই।" অক্লেশে মিথ্যা বলে গেছি।

তাঁর শেষ জীবনে বড় মজা দেখেছি। তিনি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। Continuous Blood Sugar ছিল ৪৮০। Blood Pressure ছিল ২২০ মত। মাথা ঘুরতো, কথা বলতে চাইতেন না। শারীরিক দুর্বলতার জন্য চোখে জল এসে যেত, কিন্তু বাইরের কেউ এলে সেই শান্ত হাসিমুখ। দু-চারজন একসাথে এলে একরকম। কেউ একা এলে আমাকে চা দিতে যেতে হতো। শুনতাম তাঁর সমস্যাগুলি – যেন কিছুই নয় – এমন ভাব করে শ্রীপ্রীতিকুমারের কানে তুলছেন আবার তার পরক্ষণেই বলছেন, আপনার আর কারও জন্য কোনও কাজ করা উচিত নয়। আপনার শরীর খারাপ, নিজের শরীরের দিকে দেখুন। লোকজনেরা আপনাকে কেন যে এত বিরক্ত করে? আমরা যারা কাছে আছি আমাদের কথা না হয় আলাদা ... ইত্যাদি। এইসব কপটতা দেখতে দেখতে আমার পক্ষে মাঝে মাঝে ধৈর্য রাখা দায় হয়ে যেতো। দু-চার কথা বলে ফেলতাম। ফলে দাদা মাটির মানুষ, বৌদি মুখরা। আজ সেই বৌদি যে তার স্বামীকে ধরে রাখতে পারেন নি ... সে দায় বৌদির তো একার নয়।

শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রয়াণ আমাদের কাছে এত আকস্মিক তা বলবার নয়। যে লোকটি উঠলেন, চা খেলেন, তার দশ মিনিটের মধ্যে ভাবা যায় না তিনি চলে যাবেন। আর পাঁচ দিনের মাথায় থানা পুলিশ কেস ইত্যাদি। সেই সময়ে কারা সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন তা আগেও বলেছি। বারবার তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। আমার আর বাপীর অপরিশোধ্য ঋণ আমি বারবার

স্বীকার করেছি। আরও বেশী করে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। তবু বলেছি শ্রীপ্রীতিকুমারের গাঁথা মালাটা আমি গলায় পরে বসে আছি। বিধির বিধান খণ্ডাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার?

এখন কিশোর সম্বন্ধে যদি একটু না বলি অনেকের কাছে সে অপরিচিত থাকবে। শ্রীপ্রীতিকুমার ছিলেন কিশোরের "মামা"। পিতৃহারা ছেলেটি মামাকে মাথায় করে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু আসা যাওয়ার সময়ের সীমারেখা ছিল না। ফলে সে অনেকের চোখের আড়ালে ছিল। তাকে দেখে অনেকে জিজ্ঞেস করতেন, "কে এ ছেলেটি? আগে দেখিনি তো!" আসলে শ্যামবাজারে মোটামুটি "তেমাথার" অধিষ্ঠান ছিল, কারণ তাঁরা শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। তাই তারা কিশোরকে বেশী দেখেন নি। তাছাড়া কিশোর আগে আসবে কি করে? আগে তো তার বাবা আসতেন। কিশোরের কথা আলাদা করে লেখবার উদ্দেশ্য হল কিশোর তার মামার আশীর্বাদ অনেক পেয়েছে। তার ফুটফুটে মেয়েটা যতদিন ঘুরবে তার সামনে দিয়ে, ততদিন সে তার মামাকে ভুলতে পারবে না। শ্রীপ্রীতিকুমার তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু আমি কি আর কিশোরের কাছে কোনও প্রতিদান চাইতে পারি? আমার নিজের ওজন আমি বুঝে চলি। কিশোর যা করেছে, তার কৃতজ্ঞতা থেকে, ভালবাসা থেকে, তার শ্রদ্ধাবোধ থেকে। সে তার মামাকে হারিয়ে মামীমার দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করেছে। সেটাতো সে নিজের বোধ বুদ্ধি থেকে করেছে। মামীমাতো তার কাছে দাবী করেনি, আবার সে যা করেছে মামীমা তা অস্বীকারও করছে না। সব মানুষেরই দিন আসে। মামা তাদের দুহাত ভরে দিয়ে গেছেন, মামীমার সে ক্ষমতা নেই। যেদিন ক্ষমতা হবে, ঋণ শোধের চেষ্টা করবেই। অবশ্য অসময়ের ঋণ শোধ করা যায় না, সেটা স্বীকার করেই নিচ্ছি।

তবে আমাদের জন্য "অনেক" করেছেন এমন কেউ যদি আমাদের মনে করিয়ে দিতে চান বারবার, যে, এই দুর্বিপাকের সময় তিনি কতটা করেছেন, তিনি ছাড়া আর কেই বা পাশে দাঁড়াত – আমি তো চুপ করে শুনব না। তাকে একটা আয়না কিনে দেব নিজের মুখ দেখার জন্য, আর প্রশ্ন করব, শ্রীপ্রীতিকুমারকে তিনি কতটা ব্যবহার করেছিলেন – কতটুকু দিতে পেরেছিলেন, আর কতটা নিংড়ে নিয়েছিলেন।

শ্রীপ্রীতিকুমারের ভাঁড়ার ঘর সামলাতে গিয়ে আমারতো সেই 'অনভ্যাসের ফোঁটা' পরবার অবস্থা। এ কাজটি গত তিরিশ বছর ধরে শ্রীপ্রীতিকুমার নিজেই

করতেন। তিনি ওটি করতেন বলে আমি খুব নিশ্চিন্ত ছিলাম। মাঝে মাঝে বলে উঠতাম, "বাবা! যারা এত ভাঁড়ারের কৌটো খুলে দ্যাখে তারা ভগবানকে কখন ডাকবে?" দশ দিন শুনতে শুনতে একদিন জবাব দিলেন, "ভাঁড়ারে কি দেখি জান? দেখি ক'দিনের খাবার আছে। যদি দু'দিনের থাকে, তাহলে জানব দু'দিনই নিশ্চিন্তে ভগবানকে স্মরণ করতে পারব।" – এ কথা শোনবার পর আর কোনও দিন কিছু বলিনি।

আমরা যাদের ভালবাসি তাদের জন্য কিছু করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করি। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। ভালবাসা শব্দটি দেনা-পাওনা শব্দটিকে হারিয়ে দেয়।

মনু টুকটুক করে চলে আসে। কোথায় একটি সোয়েটার বোনা, কোথায় শাড়ীতে ফলস বসান – যেটুকু সম্ভব করে। তার কাছে আমিতো দাবী করিনা।

রেখা জার্মানীতে থাকে। দেড় মাসের জন্য আসে। বৌদিকে কি করে সেবা করবে ঠিক করতে পারে না, যা বলি তাই। আমি কি তাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করি? নিশ্চয়ই নয় .....

এই প্রসঙ্গে কেয়ার কথা না বলে পারছি না। আমার নিজের বোন থাকলে কতটা ভালবাসতাম জানিনা, নিশ্চয়ই কেয়ার থেকে বেশি নয়। শ্রীপ্রীতিকুমার থাকতেই কেয়ার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা। তিনি প্রয়াত হবার পর কেয়া কি ভাবে ভালবাসা দিয়ে, সাহস দিয়ে, অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সে কথা স্বীকার না করলে আমার অন্যায় হবে। শ্রীপ্রীতিকুমার কেয়া এলে খুব খুশী হতেন। জামাই বাবুর জন্য খালি হাতে আসা তো কেয়ার কুষ্ঠীতে লেখেনি। আজও সে অভ্যেস বজায় রেখেছে। কেয়াকে শ্রীপ্রীতিকুমার বলেছিলেন, "তোমার দিদি আমার শরীরের অবস্থা বুঝতে পারে না।" কেয়া ২৪শে নভেম্বরের দু'দিন আগে বলল, "শুক্লাদি, জামাইবাবুর পায়ের অবস্থাটা ভালো মনে হচ্ছে না।" শরীর বা পা কিছু একটা ভালো নয় বলেছিল, আমি বিশ্বাস করিনি। আমি মৃত্যুকে কখনো কাছ থেকে দেখিনি। তাছাড়া আমার স্বামী এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন আমার বিশ্বাসের মধ্যে ছিল না। আমার এখন মাথা কুটতে ইচ্ছে করে কেয়ার কথা শোনবার পরেও কেন জিজ্ঞেস করিনি তাঁর অবর্তমানে যদি কোন সমস্যা আসে, আমি কি করব, অথবা তাঁর জন্য কি কি করবার আছে।

বাপী একদিন বললো, ভগবান তাঁর পূজা নিজেই গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করেন। আসলে আমার তো ঈশ্বরকে ডাকবার দরকার এতদিন হয়নি। ঘরে একজন সাত্ত্বিক সুন্দর মানুষ বসে আছেন যাকে আমার "মহাপুরুষ" মনে হয়েছে, আমার কোনও চিন্তা ছিল না, জানিয়ে দিয়েই বেরিয়ে যেতাম। এখন কিন্তু বুঝতে পারছি তিনি আমাকে একটু বেশিই ভালবাসতেন এবং সেই কারণে গত আড়াই বছরে আমাকে তিল তিল করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। আমার এখন আর একবারও মনে হয় না, তিনি নেই। ... মনে হয় সব দেখছেন। উপভোগ করছেন। তাই রাগ হলে তাঁর কপালে চন্দনের ফোঁটাটা বেশ জোরের সাথে চাপিয়ে দিই আর মেজাজ ভালো থাকলে আস্তে আস্তে ফোঁটাটাকে গোল করে পরাবার চেষ্টা করি। এক বছর আগেও বলতাম, "দয়া করে আমার সামনে এসে দাঁড়াবার দরকার নেই।" এখন কিন্তু বলি –"আমার খুব ইচ্ছে করে মাথায় একটু হাতের স্পর্শ পাই যেমন ১৯৫৬ সালে পেতাম ....."

– – – – – – – – – –

(** রচনাকাল - এপ্রিল, ১৯৮৯)

আনন্দ-ভগবান **শ্রীঅরবিন্দ**

প্রারম্ভে আমাদের মন অথবা প্রাণ যে অভিপ্রায়ের প্রেরণাতেই যোগ সাধনা আরম্ভ করুক না কেন, সত্তার মধ্যে ভগবানকে চাওয়া যদি প্রকৃতই থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত ভগবৎ উপলব্ধি হবেই। অন্তরস্থ আত্মার মধ্যে সর্বদাই ভগবানকে চাওয়ার ব্যাকুলতা আছে। কোন একটা বিশেষ অভিপ্রায়কে আত্মা ব্যবহার করে যার সাহায্যে মন ও প্রাণকে অন্তরের প্রেরণা অনুসরণ করানো যায়। ভগবানের প্রতি আত্মার যে অহৈতুকী ভালবাসা আছে তা যদি মন ও প্রাণ গ্রহণ করে এবং অনুভব করে তাহলে যোগ সাধনা পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং অনেক বাধা বিঘ্ন দূরে যায়। মন-প্রাণ যদি আত্মার নির্দেশ না মানে তাহলেও তারা যা চায় তা ভগবানের কাছ থেকে পায়, এবং কিছু আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও তাদের হয়

যার প্রভাবে তাদের প্রাথমিক বাসনা কামনাকেও তারা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

ভগবানকে নিরানন্দময় বলা মূঢ়তারই পরিচয়। ভগবান সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা মনের অজ্ঞানতাই করতে পারে। রাধা প্রেম ঐরকম ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। রাধাপ্রেমের সরল অর্থ এই যে ভগবানের মিলনের পথে যাহাই আসুক না কেন– বেদনা অথবা আনন্দ, মিলন অথবা বিরহ– আর বেদনা যত দীর্ঘ সময়ই স্থায়ী হোক না কেন, এই প্রেম অটল এবং তার বিশ্বাস এবং নির্ভরতা অক্ষুন্ন থাকে এবং ধ্রুব তারার মতনই পরমতম প্রেমাষ্পদের অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেয়।

দিব্যানন্দের প্রকৃত স্বরূপ কী? মনের কাছে উহা একটি মনোরম মানসিক অবস্থার বেশী আর কিছু নয়। দিব্যানন্দ যদি তাই হত তা হলে ভক্ত আর ভাবযোগীরা ইহার মধ্যে রসোন্মাদনার সন্ধান পেতেন না। আনন্দ যখন আমাদের কাছে আসে, তখন ভগবানই আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন। আর যখন আমরা আলোকের দ্বারা প্লাবিত হই তখন ভগবান নিজেই আমাদিগকে চারিদিক থেকে প্লাবিত করেন। অবশ্য ভগবান ঐসবের থেকেও অনেক বেশী; তিনি আরও অনেক কিছু, এবং ঐ সবের মধ্যেই আছে তাঁর উপস্থিতি, তাঁর সত্তা, তাঁর দিব্য ব্যক্তিত্ব। কারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবানই শিব, তিনিই পরম জননী। আনন্দের মাধ্যমেই আনন্দময় কৃষ্ণের উপলব্ধি হয়, কারণ আনন্দই কৃষ্ণের সূক্ষ্ম দেহ এবং সত্তা। শান্তির মাধ্যমে শান্তিময় শিবের সাক্ষাৎকার হয়। আলো, মুক্তিদায়ী শক্তি, প্রেম এবং সিদ্ধিদাতা ঊর্ধ্বে উত্তোলনকারী শক্তির মধ্যে দিব্য জননীর উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। ঐ সব উপলব্ধিই ভক্ত এবং ভাবযোগীদের অভিজ্ঞতাকে হর্ষাকুল করে এবং তীব্র মনোবেদনা ও বিরহের রাত্রি সহজেই সহ্য করতে সক্ষম করে। আত্মার এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি সামান্য মাত্র সংক্ষিপ্ত আনন্দকেও এক অনন্য শক্তি বা প্রাধান্য দেয় যার সাহায্যে আনন্দ বর্ধিত ও স্থায়ী হয় এবং প্রত্যাগমন করে।

দিব্য করুণা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবার জন্য প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। অজ্ঞানের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আমরা যখন আলোকের

অনুগামী হই তখনই দিব্য করুণার অনুভূতি আমাদের হয়। উহা ক্ষণিকের জন্য অলৌকিক কাজ করে সরে যায় না। দিব্য করুণা আমাদিকে আলোকের পথে যেতে সাহায্য করে এবং পরিশেষে অজ্ঞানতা থেকে উদ্ধার করে।

ভগবান অনেক সময় আমাদিকে অন্ধকার পথ দিয়ে নিয়ে যান, কারণ, অন্ধকার রয়েছে আমাদের মধ্যে এবং আমাদের চারিপাশে। কিন্তু তিনি আমাদিকে আলোকের দিকেই নিয়ে যাচ্ছেন, আর কোন কিছুর দিকে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সহচর হৃদয়রাম

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(কথকতায় লীলাকথা)

শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য সহচর ভাগ্নে, তাঁর একনিষ্ঠ সেবক ও লীলার বিশিষ্ট সহায়ক শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। ভক্তদের কাছে ইনি হৃদয়, হৃদু, হৃদে ইত্যাদি নামে সুপ্রসিদ্ধ। এই ভাগ্যবান সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর কাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেবা করেছেন।

পরম পুরুষের লীলা-রঙ্গের আর এক অঙ্ক শুরু হবে এবার। মনে হয়, তাঁর রঙ্গমঞ্চে হৃদয়ের অভিনয় সাঙ্গ হয়েছে। যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য ইনি মর্ত্যলোকে এসেছিলেন, তা সম্পূর্ণ হতে চলেছে। ইনি ঠাকুরের লীলার আসর থেকে এখন নেমে আসবেন ও দর্শকদের আসনে গিয়ে বসবেন।

এই হৃদয়রাম এক অত্যাশ্চর্য চরিত্র, এক অনন্য সাধারণ আধার। শ্রীরামকৃষ্ণের এত ঘনিষ্ঠ সঙ্গ, এত প্রাণঢালা সেবা পরিচর্যা, তাঁর প্রতি এমন টান, এমন মমতা আর দেখা যায় না। ইনি যে পরিমাণে ঠাকুরের সঙ্গ-সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, সেবা-তত্বাবধান করেছিলেন, মর্ত্যলোকবাসী আর কারো জীবনে এমনটি দেখা যায় না। এখন এঁকে সরে যেতে হচ্ছে একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে।

‘ভাগ্যবান যেন হৃদু তেন দুরদৃষ্ট।
এত সেবা করি পরে দিল এত কষ্ট।।’ পুঁথি

শ্রীশ্রীমা সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে নহবতে বাস করেন। কালীবাড়িতে নিত্য এত লোকজনের যাতায়াত, এত কর্মচারী, কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থান ও গতিবিধি কেউই জানতে পারে না। এমনই নীরবে ও সংগোপনে বিন্দুবাসিনী লজ্জারূপিনী মা নহবতে জীবনযাপন করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্রের আর একটি গুণ, তাঁর সহ্যশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি এত সহ্য করেছেন, তা ভাবাও যায় না। যখন জয়রামবাটীতে ছিলেন, তখন তিনি বছরের পর বছর অবিরাম পতিনিন্দা শুনেছেন। দক্ষ দুহিতা সতী পতিনিন্দা শুনে সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করে ছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা ধরিত্রীর মত সর্বংসহা। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের লীলার নায়িকা হয়ে এসেছেন। তাই তিনি ঠাকুরের অবতার লীলার পুষ্টির জন্য জীবন ধারণ করে রয়েছেন।

‘মায়েতে মায়ের ধারা সহ্য অতিশয়।
হেন মায়ে বহু কষ্ট দিয়াছে হৃদয়।।’ পুঁথি

হৃদয়ের আচরণ ও প্রকৃতিতে এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কাল এঁর সেবাধীন হয়ে আছেন। ইনি ছাড়া তাঁর এক মুহূর্তও চলে না। অথচ ইনি এখন কারণে অকারণে তাঁকেও তাড়না করেন, তিরস্কার করেন। এঁর হাঁক-ডাঁকও এখন খুব বেড়ে গেছে। শ্রীশ্রীমাকেও ইনি জ্বালাতন করেন, কটু কথা বলেন। এঁর প্রবল তাড়নায় ঠাকুর কখনও কখনও নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন, কখনো বা সরবে কাঁদেন।

“একদিন মিষ্টভাবে বিনয় করিয়া।
হৃদয়ে কহেন প্রভু মায়ে দেখাইয়া।।
উনি যদি হন রুষ্টা রক্ষা নাহি আর।
সাবধানে কর কর্ম মিনতি আমার।। পুঁথি

ঠাকুর একদিন ভাগ্নেকে অনেক বুঝিয়ে ও মিনতি করে বলেন-“ওরে হৃদু! তুই আমায় ব্যথা দিচ্ছিস, কষ্ট দিচ্ছিস - আমি সব সহ্য করছি, আরো সহ্য করব। কিন্তু তোর মামীকে তুই দুঃখ কষ্ট দিসনি। তোর প্রতি যদি উনি রুষ্টা হন, তা হলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব- এঁদেরও সাধ্য নেই যে তোকে রক্ষা করেন। দেখ্ হৃদু! ও আমারই শক্তি। মহাশক্তি জীবকে চৈতন্য দিতে এসেছে। ওঁর রূপ থাকলে, অশুদ্ধ চোখে দেখে পাছে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।”

হৃদয়কে ঠাকুর এত করে সাবধান করে দিলেন তবুও এঁর হঁশ হল না। এঁর স্বভাব-প্রকৃতিতে এখন রুক্ষ ভাব এসেছে।

'কেবা শুনে কার কথা হয়েছে সময়।
আপন স্বভাবে কর্ম করেন হৃদয়।।
কত সহিবেন এত তাড়না প্রবল।
স্বকর্মে হৃদয় পরে পায় প্রতিফল।।' পুঁথি

যে সময় হৃদয় কালীবাড়ি থেকে বিদায় নিচ্ছেন, সে সময় শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে নেই। তিনি তখন রয়েছেন পিত্রালয়ে - জয়রামবাটীতে, অথবা কামারপুকুরে- ঠাকুরের ভিটেতে। তাঁর জননী শ্যামাদেবী একবার তাঁকে ও তাঁদের গ্রামের কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের এক ভাই অভয় কলকাতায় গিরিশ বিদ্যারত্নের বাসায় থেকে ডাক্তারি পড়তেন। যা হোক, সেদিন তাঁরা কলকাতায় পৌঁছে ঐ রাত্রে বিদ্যারত্ন মশায়ের বাসাতে থাকেন।

পরদিন শ্যামাদেবী সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সকালের দিকে, অনেক বিলম্ব করে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান। ঐ অসময়ে সেই দলবলের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করা হৃদয়ের পক্ষে বেশ সমস্যা হয়। তাই শ্যামাদেবীকে ইনি খুব তিরস্কার করেন, ঐ অসময়ে দলবল নিয়ে আসার জন্য। শামাসুন্দরী ঠাকুরের শাশুড়ি হলেও তিনি ছিলেন হৃদয়ের দেশের – শিহড়ের মেয়ে। হৃদয়ের ছোট ভাই লক্ষ্মী (রাজারাম) শ্যামাদেবীর কন্যা সারদার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ-সম্বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যা হোক, নিজেদের গ্রামের-পাড়ার সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে, হৃদয়ের ঐ আচরণে তেমন কোন বাধা-সঙ্কোচ ছিল না। ওরূপ ব্যবহার করা এঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু হৃদয়ের ঐ আচরণে শ্যামাদেবী এত মনঃক্ষুণ্ণ হন যে চোখের জল ফেলেন এবং বলেন- "এখানে মেয়েকে কার কাছে রেখে যাব!" তিনি ভাবেন যে, তাঁদের জামাই-এর তো কোন ব্যক্তিত্ব নেই, মুখে কোন কথা নেই, একটি প্রতিবাদও নেই। তিনি তো হৃদুর একেবারে অধীনস্থ হয়ে আছেন। এখানে মেয়ে থাকলে তাঁর উপর না জানি কত অত্যাচার-নির্যাতনই হবে।

তাই শ্যামাদেবী দুঃখ করে বললেন- "চল আমরা ফিরে যাই।" শ্রীশ্রীমা ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। রামলাল (ঠাকুরের ভাইপো) তাঁদের পারের নৌকো ডেকে দেন। বিদায়কালে, ভবতারিণীর মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে শ্রীশ্রীমা

চোখের জল ফেলেন। প্রতিবেশিনীদের সামনে জননীর প্রতি ভাগ্নের অমন কঠোর ব্যবহার তাঁকে দারুণ মনঃকষ্ট দেয়। যা হোক, তিনি কেঁদে কেঁদে ভবতারিণীকে বলেন–"মা! যদি তুমি নিজে আমাকে কখনো এখানে আনাও তা হলে আসব। তা না হলে, আর আসব না দক্ষিণেশ্বরে।" –এই ধনুর্ভঙ্গ পণ করে তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে চলে যান জয়রামবাটীতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে মহাশক্তি স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে জগদ্ধিতায় নরলীলা করছেন, তাঁর ইচ্ছায় দক্ষিণেশ্বরের রঙ্গমঞ্চ থেকে এখন হৃদয়ের বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত। ইনি বিদায় না নিলে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সেবাধিকার পান না। এছাড়া, আরও বহু বিপত্তি রয়েছে। আমরা জগদ্ব্যাপী এই যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ–মঠ–মিশন প্রভৃতি দেখছি এগুলোরও সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। ঠাকুরের লীলার মঞ্চে যাঁরা ঈশ্বরকোটি, পার্ষদ, অন্তরঙ্গ ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত, তাঁদের আমরা পাই না। আরও অনেক গূঢ় ব্যাপার আছে। হৃদয় সমস্ত দিক অধিকার করে আছেন। সব দ্বার ইনি একাই শক্তভাবে আগলে রেখেছেন।

শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আসতেন – ঠাকুরকে দর্শন করবেন, গঙ্গা স্নান করবেন, কিছুদিন থাকবেন– এইসব অভিপ্রায়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাধিকার তাঁর ছিল না। হৃদয়ই ঠাকুরের জন্য রান্নাবান্না করা, সময় মত তাঁকে স্নানাদি করানো, খাওয়ানো, দেখাশোনা করা–যাবতীয় কাজ একাই করতেন। শ্রীশ্রীমা এলে তাঁরও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা, তত্ত্বাবধান করা, অসুখ–বিসুখ করলে চিকিৎসা করানো – সব দায়িত্বই এঁকে পালন করতে হত।

শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানাদি নেই, স্বামীর নিবিড় সঙ্গলাভ, তাঁর সেবাধিকার পাওয়া– এসবেরও সুযোগ আসবে না, পিত্রালয়েও ছন্নছাড়া অবস্থা, তাহলে কি নিয়ে এই গ্রাম্য কন্যা জীবন যাপন করবেন? পরবর্তী কালে ঠাকুরের অত সঙ্গলাভ, অত সেবা–পরিচর্যা করেও তো তিনি ছিন্নবসনা, রুক্ষকেশা হয়ে অনাহারে, অর্ধাহারে কামারপুকুরে পতির ভিটায় পড়ে ছিলেন। অবশেষে, তাঁর নানা দুঃখ–দুর্দশার কথা জেনে ঠাকুরের ভক্তেরা তাঁকে কলকাতায় আনান।

তিনি রাজরাজেশ্বরী, মাথায় সোনার মুকুট পরে পদ্মাসনে বসে আছেন, সেই মহামায়া জগজ্জননী নরলীলা করতে এসে দুঃখকষ্ট, শোক–তাপের গভীর অন্ধকার কূপে নেমেছেন, তাঁর হাতে একটি বাতিও ছিল না। জীবের জন্য তিনি কত কষ্ট বরণ করেছেন। তা না হলে জগদ্গুরুর লীলাপুষ্টি হয় না।

অবতারবরিষ্ঠের অবশিষ্ট রঙ্গ–বিলাস পূর্তির জন্যই এখন হৃদয়ের বিদায় গ্রহণ একান্তই বিধিনির্দিষ্ট। ঠাকুরের আলজিভে ঘা হয়েছিল, না ক্যানসার হয়েছিল,

না গলায় ফোড়া হয়েছিল, না মাছের কাঁটা ফুটেছিল- সে যাই হোক, হৃদয় তাঁকে দেশে নিয়ে চলে যেতেন। তাঁর চিকিৎসাদি কলকাতায় হত না। কার ভরসায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন? শ্রীশ্রীমা প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর তাঁকে কী বলেছিলেন? - "তুমি এতদিনে এলে? আমার কি সেজবাবু (মথুর বিশ্বাস) আছে? আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। সেজবাবু থাকলে তোমাকে রাজরাজেশ্বরী করে রাখতেন। এখন সেই রাম নেই, আর সেই অযোধ্যাও নেই।"

'পুরী স্বামী এ সময় মথুর-নন্দন।
ত্রৈলোক্য তাঁহার নাম বাবু একজন।।
ভক্তি পথে বাপ যেন গন্ধ নাই তার।
কালের ঢং-এর যুবা বিলাসি-আচার।।' পুঁথি

তখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির কর্তা ত্রৈলোক্য বিশ্বাস (মথুরবাবুর ছেলে)। ত্রৈলোক্যবাবু মোটেই সেবাপরায়ণ ছিলেন না। দেব-দ্বিজে তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিও তাঁর মমতা-অনুরাগ ও ভক্তি-ভালবাসার অভাব ছিল। তিনি ছিলেন যেমন বিলাসী, তেমনি স্বেচ্ছাচারী ও দাম্ভিক। এই ত্রৈলোক্য বাবুই হৃদয়কে এখন কালীবাড়ি থেকে বিদায় করবেন - জগদম্বার ইচ্ছায়।

মথুরবাবুর মৃত্যুর পরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির কী দুরবস্থা হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। মথুরের মৃত্যু না হলে, অথবা ত্রৈলোক্য তাঁর পিতার মত ভক্তিমান ও সেবাপরায়ণ হলে এই - যে শম্ভু মল্লিক, বলরাম বসু, সুরেশ মিত্র -এঁরা কি ঠাকুরের সেবাধিকার পেতেন? না রসদদার রূপে চিহ্নিত হতেন?

রাসমণি একবার নবদ্বীপ থেকে ফেরার পথে বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী মন্দিরে গিয়েছিলেন। এটি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার পূর্বের ঘটনা। যা হোক, তিনি যেখানেই যেতেন, ইচ্ছা মত দান-ধ্যান করতেন। তিনি এখানেও দান করার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। কিন্তু এখানে তা করতে গেলে রাণী শঙ্করীর অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। তখন রাসমণি তাঁকে সবিনয়ে নিজ ঐ অভিপ্রায় জানান। তা শুনে রাণী শঙ্করী তাঁকে বলেন-"এখানে তোমাকে তা করার অনুমতি দিব না। এখানের সব ব্যবস্থাই আমার। তুমি এখানে তা করলে আমার মর্যাদা হানি হবে। তবে, তুমি এখানকার ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের যা দান করবে বলে মনস্থ করেছ, সেই পরিমাণ অর্থ আমি তাঁদের দিয়ে দিব।"

হৃদয় যদি সরে না যান, অথবা অপসারিত না হন, তা হলে মাঠাকরুণ কি করে ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করেন? আর এই যে- রাখাল, লাটু, কালীপ্রসাদ, নরেন, বাবুরাম, নিরঞ্জন- এই চিহ্নিত ভক্তেরা কিভাবে তাঁর সেবা-পরিচর্যার সুযোগ পান? তাছাড়া, শ্যামপুকুর, কাশীপুর- এসব স্থানে এত লীলাকাণ্ড হয় কি করে? কাশীপুর মহাশ্মশানই বা লীলার ইতিহাসে চিহ্নিত হবে কি করে? কামারপুকুরে তো ভূতির খাল শ্মশান-টশান ছিল। কিন্তু তা হবার নয়, পরম পুরুষের লীলায় পূর্ব হতে এসব সুনির্ধারিত হয়ে আছে।

‘হরি হে তোমার মহিমা বুঝা ভার।
রাবণকে মারিয়ে অযোধ্যায় আসিয়ে,
সীতারে করিলে পরিহার।
তোমার মহিমা বুঝা ভার।।’

যে সীতাকে উদ্ধার করার জন্য এত কাণ্ড - সমুদ্র বন্ধন, লঙ্কা ধ্বংস, রাবণ নিধন; সেই সীতাকে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় এনে, আবার তাঁকে পরিত্যাগ করলেন - অন্তঃসত্বা অবস্থায় বনবাসে পাঠালেন। তিনি কি নির্বোধ ছিলেন? যিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, সর্বহৃদিবাস - সেই রামচন্দ্র এই আচরণ করলেন কেন? এ অতি গুহ্যাতিগুহ্য ব্যাপার। অবতার পুরুষদের সমস্ত লীলা-চেষ্টার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সখা অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন-“তুমি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, গাণ্ডীব ধারণ কর।” অর্জুন কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েও ভয়ে-দ্বিধায়, শোকে দুশ্চিন্তায় বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি যুদ্ধ করতে চান না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে বলেন -“তুমি আচার্য-গুরু, আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-বান্ধবদের নিধনের ভয়ে বিচলিত হয়েছ। কিন্তু আমি আগেই তাঁদের বধ করে রেখেছি। সবই পূর্ব হতে সংঘটিত হয়ে আছে। তুমি এখন নিমিত্ত মাত্র হও।”

আমরা ঈশ্বরের লীলা-খেলার মর্ম বুঝতে পারি না। তিনি মূর্তিমান অবতার পুরুষ হয়ে এলেও তাঁর রঙ্গ-প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। যাঁর মা, বাবা, দিদিমা প্রভৃতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অমন শ্রদ্ধাযুক্ত, ভক্তিমান ও মমতাশীল ছিলেন; সেই ত্রৈলোক্যবাবুর মতি গতি ও আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হল কেন? এও ভগবদিচ্ছা। তা না হলে, শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার-লীলা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

DO NOT COPY

‘একদিন মহাঘটা পুরীর ভিতরে।
শ্যামাপূজা সেই দিন বড় আড়ম্বরে।।
এখন হৃদয় ব্রতী শ্যামার সেবায়।
সজ্জীভূত পুজোপকরণ সমুদায়।।’ পুঁথি

সেদিন স্নানযাত্রা (১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ)। যে পুণ্য তিথিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব। হৃদয় তখন কালীবাড়ির প্রধান পুরোহিত - ঐ পুরীর কর্মাধ্যক্ষ।

লক্ষ্য করার বিষয়, মামার বৃত্তি ও পদ হৃদয় কীভাবে একে একে লাভ করেছেন। ঠাকুরকে ইনিই তুলে দিয়েছিলেন রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর হাতে। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ঠাকুর প্রথমে সম্মত হন নি। তাঁর দাদা রামকুমার তাঁকে বলেছিলেন – “সেজবাবু তোকে দেখা করতে বলেছেন।” কিন্তু ঠাকুর রাজি হন নি। তখন হৃদয় তাঁকে বোঝান- “তুমি যদি তাঁদের সঙ্গে দেখা না কর, তা হলে বড়মামার অসম্মান হবে। তুমি না হয় এখানে কোন কাজ নিতে স্বীকার করবে না। কিন্তু দেখা না করলে, তোমার এই অবাধ্যতায় বড়মামার অসম্মান হবে।” অবশেষে, ঠাকুর এঁকে বলেন – “তা হলে হৃদু, তখন তুই আমার সঙ্গে থাকিস।” হৃদয় রাজি হন – “ হ্যাঁ মামা, আমি তোমার সঙ্গে থাকব।”

বড়মামাকে হৃদয় সে কথা জানান- “ছোটমামা দেখা করতে রাজি হয়েছে।” রামকুমার তখন ছোট ভাই রামকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে কুঠিবাড়িতে যান। হৃদয় ও তাঁদের পেছনে পেছনে সেখানে হাজির হন। রাসমণি ও মথুরবাবু ঠাকুরকে বহু সমাদর করেন ও বলেন – “এখানে এমনি এমনি রয়েছ কেন? দাদার বয়স হয়েছে। তুমি তাঁর কাজের কিছু ভার নাও। তোমারও ব্যবস্থা করে দেব। দাদার সঙ্গে তুমি এখানে থাক।”

উত্তরে ঠাকুর বলেন – “আমি ওসব পারব নি।” তারপর ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করেন –“এখানে কী কাজের ভার দেবে?”

মথুর- তুমি তো শিবের সুন্দর মূর্তি গড়েছ। আর কত সুন্দর করে সাজিয়েছ। মা ভবতারিণীকে তুমি বসন-অলঙ্কার দিয়ে সাজাবে, আর নানা পুষ্পাভরণ দিয়ে মাকে ভূষিতা করবে।

ঠাকুর- আমি অলঙ্কার-পত্রের দায়িত্ব নিতে পারব নি। ওসব হাঙ্গামায় আমি থাকব নি।

হৃদয় তখন ছোটমামাকে পেছন থেকে আঙ্গুলের টিপ দিয়ে বোঝান- "এঁরা বড়লোক ধনী-মানী ব্যক্তি। এঁদের অবাধ্য হয়ো না। বরং চুপ করে থাক।" ঠাকুর তাতে বোঝেন যে, হৃদয় তাঁকে ঐ কাজের ভার গ্রহণ করতে বলছেন। তখন তিনি মথুর বাবুকে বলেন-"তবে এই ভাগ্নে যদি আমার সঙ্গে থাকে তা হলে বরং আমি ভেবে-চিন্তে দেখব।" উত্তরে মথুরবাবু সানন্দে তাঁকে বলেন- "তুমিও থাকবে, আর ভাগ্নেও থাকবে।"

এইভাবে কালীবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ মা ভবতারিণীর বেশকার রূপে নিযুক্ত হন। আর ফুলটুল তোলা, মন্দিরের সব জিনিষ পত্রের হেফাজত করা, গয়নাগাঁটি তুলে রাখা, বের করা ইত্যাদি কাজের ভার পান হৃদয়। কিছুদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুমন্দিরে রাধাকান্তজীর পূজায় নিযুক্ত হলে হৃদয় ভবতারিণীর বেশকারের পদটি পান। ঠাকুর ছ' মাস বিষ্ণু মন্দিরে পূজা করার পর কালী মন্দিরে ভবতারিণীর পূজায় ব্রতী হন। তখন হৃদয় বিষ্ণুমন্দিরের পূজক পদটি লাভ করেন। ভবতারিণীর পূজা করতে করতে ঠাকুর প্রবল ভাবের আবেশে 'দিব্যোন্মাদ' হন। ঐ অবস্থায় বিধিপূর্বক পূজানুষ্ঠান সম্পাদন করতে তিনি ক্রমশঃ অসমর্থ হয়ে পড়েন। মথুরবাবু তখন বিশেষ চিন্তান্বিত হন- এখন উপায় কি? জগদম্বার নিত্য পূজাদির ভার কাকে দেবেন?

সেই সময় একদিন ভবতারিণীর পূজা করতে করতে ঠাকুর হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে যান এবং ভাগ্নেকে ধরে ঐ আসনে বসিয়ে দেন। তিনি এঁকে বলেন- "হৃদু, আজ থেকে তুই মায়ের পুজো করবি। মা আমায় বললেন-"এতকাল যেমন প্রীতির সঙ্গে তোর পুজো নিয়েছি, আজ থেকে তেমনি করে আমি হৃদুর পুজো নেব।" হৃদয় তখন ভবতারিণীর পূজা আরম্ভ করেন। মা কেমন আহ্লাদে এঁর পূজা গ্রহণ করছেন, ঠাকুর দাঁড়িয়ে তা দেখতে থাকেন। ঠিক সেই সময় মথুরবাবু সেখানে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখে ঠাকুর চমকে উঠেন। সামান্য মানুষের মত আচরণ- অন্যায় করে ফেললেন নাকি? তাই ভয়ে ভয়ে তাঁকে বলেন – "ওগো সেজবাবু! মা আমায় বললে আর তোকে পুজো করতে হবে নি। মা আজ থেকে হৃদুর পুজো নেবে।" মথুরবাবু ঠাকুরের ঐ ব্যবস্থায় এক বিষম সমস্যা ও দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হন। তিনি বলেন – "বাবা! আমি বিশেষ ভাবিত ছিলাম, মায়ের পুজোর কী ব্যবস্থা হবে, এই কাজে উপযুক্ত কাকে নিযুক্ত করব! তুমি বাবা ঠিকই করেছ।"

ভাগ্যবান হৃদয় এই ভাবে মামার পদ ও আসন একে একে লাভ করেন। স্বয়ং ঈশ্বর যাঁকে বড় করেছেন, উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেছেন, তাঁকে উপেক্ষা করে, সমালোচনা করে কখন ছোট করা যায় না - হেয় করা যায় না। ইতিহাস সহস্র চক্ষু, তার দৃষ্টিশক্তি যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর। সমুদ্রের তলদেশ থেকে সব অমূল্য রত্ন উদ্ধারের ব্যবস্থা হচ্ছে। পৃথিবী সাক্ষী রূপে ঘুরে ঘুরে সব দেখছে। হাজার বছরে এই পৃথিবীর বুকে অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু পরমপুরুষের সঙ্গে তাঁর এই বিশিষ্ট লীলা-সহচরের যে নিবিড় সম্বন্ধ এবং এই ভাগ্যবানের সঙ্গে তাঁর বিচিত্র লীলাবিলাসের উজ্জ্বল চিত্রগুলো কোনদিনই বিলুপ্ত হবে না। সমস্ত 'লীলা প্রসঙ্গ' ও 'পুঁথি' জুড়ে রয়েছে হৃদয়ের দেওয়া সব তথ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব জীবনের যত কাহিনী, যত সাধনা, যত তীর্থযাত্রা, স্বদেশে-বিদেশে – সব সময়েই হৃদয় রয়েছেন ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে।

"মথুর হৃদয় দোঁহে নন্দি ভৃঙ্গিদ্বয়।
মথুর সেবিল অর্থে সামর্থ্যে হৃদয়।।" পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা মথুরবাবু করেন অর্থ দিয়ে চোদ্দ বছর, আর হৃদয় করেন প্রাণঢালা মমতা ও অদম্য সামর্থ্য দিয়ে চব্বিশ বছর। "কল্পতরু শ্রীদেহের একমাত্র মালী"। হৃদয় বিবাহিত ছিলেন। এঁর সন্তান এবং পরিজনবর্গও ছিল। কিন্তু ইনি ঠাকুরের সঙ্গে লক্ষ্মণের মত জীবনযাপন করেন। তাঁর সঙ্গে সর্বদাই ইনি থেকেছেন। তিনি যখন যেখানে গমন করেছেন, ইনিও তখন সেখানে গিয়েছেন- তাঁর সেবা-পরিচর্যা ও নিরন্তর তত্বাবধান করার জন্য। তাঁকে ইনি বেশ কয়েকবার মৃত্যুর কবল থেকে অসাধারণ তৎপরতার সঙ্গে রক্ষাও করেন। বৃন্দাবনে গঙ্গামাতার প্রেমে আবদ্ধ হয়ে ঠাকুর তাঁর কাছে থাকার জন্য সঙ্কল্প করেন। হৃদয় তখন মথুরকে দিয়ে তাঁর জননী চন্দ্রাদেবীর কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন এবং গঙ্গামাঈর কঠোর কবল থেকে জোর করে তাঁকে ছিনিয়ে আনেন। বস্তুতঃ এঁর একনিষ্ঠ সেবা, মমতা, উদ্যম, আত্মত্যাগ – সাধারণ মানুষ কখন কি ভাবতে পারে? না এঁর মুল্যায়ন করতে পারে?

কেশবচন্দ্র সেনের কমল কুটীরে তোলা শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোগ্রাফেই প্রমাণ পাওয়া যায় – ঠাকুর ও হৃদয়ের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ। ঐ চিত্রে দেখা যায়, ঠাকুর দন্ডায়মান সমাধিমগ্ন। সেবক হৃদয় সযত্নে তাঁকে ধরে রেখেছেন। ঠাকুরের অমন বিচিত্র ও বিরাট সাধন লীলার ইনিই একমাত্র অবলম্বন। খুঁটি যেমন প্রতিমাকে ধরে রাখে, হৃদয় তেমন বরাবর ধরে রাখেন ঠাকুরকে। দুশ্চর সাধন কালে

তাঁর সঙ্গে দাদা, সহধর্মিনী, অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন কেউই ছিলেন না। তখন হৃদয় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষণ না থাকলে এবং প্রাণঢালা সেবা-যত্ন না করলে তাঁর দেহ থাকত না। অধিকন্তু তাঁর ঐ কালের বিধির লীলারঙ্গের চিত্রমালাও পাওয়া যেত না।

'দশমবর্ষীয়া এক ত্রৈলোক্যের মেয়ে।
পূজা দেখিবারে আসে পুলকিত হয়ে।
নানাবিধ অলঙ্কারে অঙ্গ সুশোভন।
পরিধানে ঘোর লাল চেলীর বসন।।
পরমা সুন্দরী বালা মনোহরা ছবি।
দেখিলেই মনে হয় যেন বনদেবী।' পুঁথি

সেই উৎসবের দিনে ত্রৈলোক্যবাবুর দশমবর্ষীয়া এক কন্যা ভবতারিণীর মন্দিরে পূজা দেখতে আসে। গৌরবর্ণা সুন্দরী ফুটফুটে রূপসী মেয়ে। নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, টুকটুকে লাল বেনারসী শাড়ী পরা, পায়ে নূপুর ও আলতা শোভিত। অত বড়লোকের মেয়ে। রূপে লাবণ্যে, অলঙ্কারে পরিচ্ছেদে যেন স্বর্গের এক দেবী। বালিকাটি ঐ মন্দিরের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে পূজা দেখছে।

হৃদয় তখন মা কালীর পূজায় রত। হঠাৎ ঐ বালিকাকে দেখে ইনি প্রেম-ভক্তির আবেশে উচ্ছসিত হয়ে পড়েন। তারপর মায়ের পূজার পুষ্পপাত্র থেকে মুঠো মুঠো ফুল-চন্দন-বেলপাতা তুলে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে সেই বালিকার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

'ভাবের আবেশে মত্ত, আচরণ কত মত,
বিশেষিয়া কহা নাহি যায়।' পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের আবেশে নিজের সহধর্মিনীকে পূজা করেছিলেন। ভারতবর্ষে পতি পরমারাধ্য দেবতা। ব্যাস, বাল্মীকি, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ – এঁরা তো কত মহাকাব্য, কাব্য সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু পতি তাঁর ধর্মপত্নীকে পূজা করছেন – এমন চরিত্র তো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। একটা কথা প্রচলিত আছে – "যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে।" ভারত মানে মহাভারত। অর্থাৎ মহাভারতে যে রকম চরিত্র ও শিক্ষাদর্শের দৃষ্টান্ত নেই, ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোথাও সেরকম চরিত্র ও আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এই লীলার নজির কি মহাভারতে আছে? ধর্মপত্নীকে তাঁর পরমারাধ্য বিশ্ব-

DO NOT COPY

গুরু পতি পূজা করলেন। নিজের জপের রুদ্রাক্ষমালা ও দ্বাদশ বর্ষব্যাপী দুশ্চর সাধনার সমস্ত ফল স্ত্রীর চরণে সঁপে দিলেন। সুতরাং ভাবোন্মত্ত সাধকের ভাবের খেলা এইরকম হয়।

'কন্যার বচনে শুনি সঠিক কাহিনী।
বুকে করাঘাত করে কান্দিয়া জননী।।
অতি অমঙ্গল কথা হইয়া ব্রাহ্মণ।
বালিকার পায়ে দিল কুসুম-চন্দন।।' পুঁথি

বালিকাটি কুঠি ঘরে ফিরে গেলে তার মা সব ঘটনা শুনে হায় হায় করতে থাকেন। –'এ কী অলক্ষণে ব্যাপার! মায়ের মন্দিরে পূজারত পুরোহিত-ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ আমাদের মেয়ের পায়ে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা করলেন! আমরা জেলে-কৈবর্ত-শূদ্র। মেয়ের নির্ঘাত অমঙ্গল হবে।"-এই বলে সেই বালিকার মা বুকে করাঘাত করে কাঁদতে থাকেন। স্ত্রীর মুখে হৃদয়ের ঐ অসঙ্গত আচরণের কথা শুনে ত্রৈলোক্যবাবু ভয়ানক উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হন – "এ কী ব্যাপার?"

'পশ্চাৎ ত্রৈলোক্যনাথ পাইয়া খবর।
ক্রোধে অন্ধ জ্ঞানশূন্য কাঁপে কলবর।।
দ্বারবানে সেইক্ষণে হুকুম জাহির।
হৃদয়ে করিয়া দিতে পুরীর বাহির।।' পুঁথি

সেদিনের পূজা-হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠান সাঙ্গ হয়। রাত্রেরও দেবীসেবার ক্রিয়া-কর্ম সমাপন হয়। তারপর ত্রৈলোক্যের নির্দেশে কালীবাড়ির দারোয়ান শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে গিয়ে বাবুর আদেশ জারি করে- "কাল সকালেই বিদায় দিয়ে এখান থেকে অবশ্যই চলে যেতে হবে।" -এই হুকুমনামা শুধু হৃদয়ের উপরেই নয়, ঠাকুরের উপরও সমভাবে জারি হয়।

'আরও শুনি সেই সঙ্গে ক্রোধান্ধ হইয়া।
বলিয়াছিলেন প্রভুদেবে উদ্দেশিয়া।।
কেমনে হইবে তাঁর থাকা এইখানে।
যথা আজ্ঞা কহে দ্বারী প্রভু নারায়ণে।।' পুঁথি

ঐ আজ্ঞা কার্যকরী হল কিনা, ত্রৈলোক্যবাবু সেবিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। যথা সময়ে হৃদয় ও রামকৃষ্ণ মাথা নিচু করে যাত্রা করেন। কুঠি ঘরের বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে ত্রৈলোক্য দ্রুত পদে ছুটে আসেন ঠাকুরের কাছে।

‘আপনি যাবেন কোথা কহে পরমেশে।
হৃদয় গিয়াছে যাক আপনার দোষে।।
ফিরায় ত্রৈলোক্য তাঁয় আপন মন্দিরে।
বিনয়-নম্রতা-শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে।।’ পুঁথি

ত্রৈলোক্য করজোড়ে সবিনয়ে ঠাকুরকে বলেন- “আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? আপনি কোথায় যাচ্ছেন?” লুটিয়ে পড়েন তিনি ঠাকুরের পায়ে এবং দুটি চরণ চেপে ধরে করুণ মিনতির স্বরে বলেন-“না না, আপনি চলে যাচ্ছেন কেন?”

শ্রীরামকৃষ্ণ- রাত্রে যে ওরা বললে, আর এখানে থাকা হবে নি।
ত্রৈলোক্য- না, আপনাকে বলা হয় নি। শুধু হৃদয়কে যেতে বলা হয়েছে।
শ্রীরামকৃষ্ণ- তা কি হয়? হৃদু না থাকলে, আমি এখানে থাকব কি করে?
ত্রৈলোক্য- সে ব্যবস্থা আমি করব। আপনার সেবক রেখে দেব। যাতে কোন অসুবিধা না হয়, আমি সব দেখব।
শ্রীরামকৃষ্ণ- তোমার কথায় নির্ভর করতে পারছিনে বাপু।
ত্রৈলোক্য- সে কি? আমার বাবা আপনাকে কত ভালবাসতেন, ভক্তি-মান্য করতেন; মা কত সম্মান-শ্রদ্ধা করতেন; আর দিদিমাও কত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন আপনাকে। আপনি এখানে থাকুন।
শ্রীরামকৃষ্ণ- তা বাপু, মায়ের ইচ্ছা যা, তাই হোক।
ত্রৈলোক্য- না না না। আপনি যাবেন না। আমি আপনার সেবা করব।

আহা! ঠাকুরের কি ক্ষমা সুন্দর নিরভিমান স্বভাব!

‘অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় রে।
অভিমানশূন্য গোরা নগরে বেড়ায় রে।।’

শ্রীরামকৃষ্ণ- ওরে হৃদু, ও হৃদু! আমাকে যেতে বলেনি রে, শুধু তোকেই বলেছে। দারোয়ান ভুল করে আমাকে বলেছে।

ত্রৈলোক্য ফিরিয়ে আনেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। তিনি চোখ মুছতে মুছতে এসে খাটে বসেন। এ তাঁর পুনঃ প্রতিষ্ঠা। দক্ষিণেশ্বর থেকে দেশে চলে গেলে তাঁর অবশিষ্ট লীলাকাণ্ড কি করে সম্পন্ন হয়? এখনো বহু কর্মকাণ্ড লীলারঙ্গে বাকি আছে। পঞ্চবটীর ভগবান জগদ্বাসীকে প্রেমভরে ডাক দিয়ে বলবেন- “ঈশ্বরলাভ মানব জীবনের উদ্দেশ্য।” সেই প্রবল ধর্মদ্বন্দ্বের যুগে তিনি উদাত্ত কন্ঠে ঘোষণা

DO NOT COPY

করবেন –"সব ধর্মমতই সত্য। যত মত তত পথ।" শ্রী শ্রীমাকে তিনি গড়ে তুলবেন জগদ্ধাত্রী প্রপালিকারূপে। তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ ও ভক্ত পরিকরদের নিয়ে কত মধুর রঙ্গ-বিলাস করবেন, তাঁর আরও কত কাজ অসমাপ্ত রয়েছে।

'পরে বহু সকাতর করে নিবেদন।
অমঙ্গল বালিকার না হয় যেমন।।
মঙ্গলনিধান প্রভু দিলেন অভয়।
অমঙ্গল কিবা কথা মঙ্গল নিশ্চয়।।' পুঁথি

ত্রৈলোক্যবাবু কাতর কণ্ঠে ঠাকুরকে বলেন-"আপনি আশীর্বাদ করুন। আমাদের খুবই সমস্যা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি আবার সমস্যা গো?

ত্রৈলোক্য-মেয়ের পায়ে হৃদয় ফুল-চন্দন দিয়েছে। সেই থেকে মেয়ের মা কেঁদে কেঁদে খুন হচ্ছে। সে খাওয়া দাওয়া সব ছেড়ে দিয়েছে, মেয়ের অকল্যাণ হবে- এই ভয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সে কি, তাতে কি অকল্যাণ হয়? বরং তোমার মেয়ের ভালই হবে বাপু।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তারপর আবার তিনি ত্রৈলোক্যকে অভয় দিয়ে বলেন-"কোন ভয় নেই। তোমার মেয়ের তাতে কোন অমঙ্গল হবে না।"

ঠাকুরের এই অভয় আশীর্বাদ পেয়ে ত্রৈলোক্যবাবু পরম আশ্বস্ত হন।

'ঈশ্বরের লীলা-খেলা কি বলিব মন।
যে হৃদয় শ্রী প্রভুর আত্মীয় স্বজন।।
বাল্যাবধি এক সঙ্গে স্বদেশে বিদেশে।
পরম সুহৃদ্-সখা-বন্ধু নির্বিশেষে।।
কাটাইল এতদিন প্রভুর সেবায়।
আজি কিবা কর্ম-ফলে তাঁহার বিদায়।।
লীলা-মর্ম বলিবারে হই অতি ভীতু।
সার অর্থ লীলা তাঁর জীব-শিক্ষা হেতু।।' পুঁথি

সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সঙ্গে যিনি এতকাল নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, কোন্ বাল্যকাল থেকে সুমধুর সখ্য সম্বন্ধ – হরিহরাত্মা। এঁর টানে ঠাকুর কতবার এঁদের শিহড়ের বাড়িতে আসা যাওয়া করেছেন,

DO NOT COPY

থেকেছেন। এমন নিত্যসঙ্গী পরমাত্মীয়-সুহৃদ-সখা সেবক-এই হৃদয় কেন এখন তাঁর সঙ্গচ্যুত হলেন?-এই ঘটনার গূঢ় মর্ম উদ্‌ঘাটন করা সুকঠিন। তবে, অবতার পুরুষের যত আচরণ-লীলারঙ্গ-উপদেশ – সবই লোকশিক্ষার জন্য, জীবশিক্ষার নিমিত্ত। তাঁর লীলা-খেলায় কি সম্ভব, আর কি অসম্ভব – আমরা তা বিচার করতে পারি না।

হৃদয় একবার ঠাকুরকে দুর্গাপূজার সময় শিহড়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর এঁকে বুঝিয়ে বলেছিলেন– "সেজবাবু আমাকে ছাড়বেনি। তবে, তুই এজন্য মন খারাপ করিস নি। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির সময় আমাকে তুই সেখানে পাবি।"

সেবার হৃদয় দেশের বাড়িতে দুর্গাপূজা করেন। নিজেই পূজকপদে ব্রতী হন। প্রতিমার পাশে মামার জন্য ইনি একটি আসন পেতে রাখেন। সন্ধ্যারতির সময় ঢাক-ঢোল-সানাই, শাঁখ-ঘন্টা-কাঁসর বাজতে শুরু হয়। ধূপ-ধুনা ও আলোকমালায় চণ্ডীমণ্ডপ পরিপূর্ণ। ভাগ্যবান হৃদয় দেখেন, ঐ আসনে শ্রীভগবান জ্যোতির্ময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমগ্ন অবস্থায় সহাস্য বদনে বিরাজিত। সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী – তিনদিনই সন্ধ্যারতির সময় মামা নির্মাণ-শরীরে সেখানে উপস্থিত হন এবং ভাগ্নের পাদ্য-অর্ঘ্য-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করে এঁকে কৃতার্থ করেন।

সুরেশ মিত্রের সিমলার বাড়িতে দুর্গাপূজার সময়(১৮৮৫ খ্রীঃ) জ্যোতি পথে ঠাকুরের গমনের সংবাদ 'কথামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। শ্যামপুকুরের বাড়িতে অবস্থান কালে তিনি ঐ ভাবে গিয়েছিলেন সেখানে। কিন্তু সুরেশবাবু তো তখন ঠাকুরকে সেখানে দেখতে পাননি, অথবা তাঁর দিব্য উপস্থিতি অনুভব করতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখে এসেছিলেন তাঁর বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা, চণ্ডীমণ্ডপ, সুরেশ কিভাবে কাঁদছেন ইত্যাদি। কিন্তু এই ভাগ্যবান হৃদয় শিহড়ে নিজেও প্রত্যক্ষ করেন মামাকে। তিনি এঁকে কথা দিয়েছিলেন – আমি উপস্থিত থাকব। হৃদয় প্রত্যক্ষ করেন, মামা ঐ পূজার কয়দিন নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত রয়েছেন। এই যে, শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে, শরীরে-অশরীরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য সঙ্গলাভ – এই ঘনিষ্ঠতার কি তুলনা পাওয়া যায়? উভয়ের এই প্রেম সম্বন্ধের গভীরতার তল কি খুঁজে পাওয়া যায়, না কখনো পরিমাপ করা সম্ভব?

শ্রীশ্রীমা প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে এলে, ঠাকুর একদিন হৃদয়কে বলেন – "ওরে হৃদু! তোর মামীর কিছু গয়না গড়িয়ে দিতে হবে; ও সাজতে ভালবাসে। আমি সীতার হাতে ডায়মণ্ডকাটা বালা দেখেছিলুম। দেখ্ তো কী তোলা আছে?"

ঠাকুর তো টাকা পয়সা ছুঁতেন না, আর বহু আগেই তো অবসর নিয়েছিলেন। শুধু মাসিক বৃত্তিটি তিনি পেতেন। তখন মথুরবাবুও নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য! ভাগ্নে হৃদয় সেই মুহূর্তে এক সঙ্গে তিনশ টাকা বের করে দেন। সে-সময় সোনা ছিল ষোল টাকা ভরি। যা হোক, ঐ টাকা দেখে ঠাকুর বিস্ময় ও আহ্লাদ প্রকাশ করে বলেন – "এ যে অনেক টাকা রে!" এতগুলো টাকা হৃদয় এক কথায় তুলে দেন। এঁর এই বিশ্বস্ততা ও নির্লোভতা সত্যি অসাধারণ নয় কি?

হৃদয় তো কালীবাড়ির কোন সম্পত্তি আত্মসাৎ বা অলঙ্কারপত্র তদ্রূপ করেন নি। চরিত্র ঘটিত কোন অভিযোগও ছিল না এঁর বিরুদ্ধে। জগদম্বার ভাবের আবেশে মত্ত হয়ে ইনি ত্রৈলোক্যবাবুর মেয়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন – এই অপরাধ। বেতনভোগী পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ তো রাণী রাসমণিকে চাপড় মেরেছিলেন। এই গর্হিত কাজ করেও তিনি কোন শাস্তি পান নি। রাণী রাসমণি ও মথুরবাবু তাঁকে চিনেছিলেন। তাঁর প্রতি উভয়েরই অন্তরে গভীর প্রেম-ভক্তি ছিল।

মথুরবাবু দেখেছিলেন – মা ভবতারিণীর পূজাকালে হৃদয়ের সর্বাঙ্গ থেকে একটা জ্যোতির আভা বেরোচ্ছে। সেই আভায় কালীমন্দির পূর্ণ। হৃদয়ের সঙ্গে মা কালীর জ্যোতি একাকার হয়েছে। হৃদয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য, গভীর ভাবস্থ, সমাহিত। ভাবের আবেশে ভবতারিণীর সঙ্গে কি কি সব কথা বলছেন। এই দৃশ্য দেখে মথুর বাবু চমৎকৃত হন এবং সবিস্ময়ে ঐ সংবাদ ঠাকুরকে জানান – "বাবা! হৃদুর কি অবস্থা দেখছি! মন্দিরের সামনে গেলে গা ছম ছম করে!"

ঠাকুরের কাছে হৃদয় আধ্যাত্মিক ভাব-বৈভব প্রার্থনা করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি এঁকে বুঝিয়ে বলেছিলেন – "এই দেখ্ হৃদু, আমার অবস্থা! দেহজ্ঞান লোপ হয়ে যায়, দিন-রাত্রির হুঁশ থাকে না। তোর এসবের দরকার নেই। তুই আমার এত সেবা করছিস, এতেই তোর সব হবে। দুজনেরই এই অবস্থা হলে কে কাকে দেখবে? কে কার মুখে জল দেবে?" কিন্তু হৃদয়ের ভেতরে তখন প্রবল বৈরাগ্য, সুতীব্র অনুরাগ অন্বেষা। মামার উপদেশে ইনি ক্ষান্ত হন না, খুব জোর করে জগদম্বাকে ধরেন। তখন এঁর ঐ অবস্থা হয়।

একদিন রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ঝাউতলার দিকে শৌচে যাচ্ছিলেন। নিত্য সঙ্গী সেবক হৃদয় হাতে গাড়ু নিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে যান। হঠাৎ ইনি লক্ষ্য করেন, ঠাকুর শূন্যে বিচরণ করছেন। আর তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছে।

হৃদয় ভাবেন – একি এত জ্যোতি? পরক্ষণে লক্ষ্য করেন, এঁর নিজেরও অঙ্গ থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছে এবং ইনিও শূন্যে বিচরণ করছেন। তখন ইনি পরম আহ্লাদে ঠাকুরকে ডেকে বলেন – "ওগো মামা! আমরা এখানকার (মর্তলোকের) নই গো। মামা! তুমি ও যা, আমিও তাই গো।" ইত্যাদি বলে হৃদয় মহানন্দে ধেই ধেই করে নাচতে থাকেন।

সামান্য একটা পরীক্ষায় পাশ করলে, তার আনন্দে কত মাতামাতি, হৈ-চৈ, সিনেমা-বায়োস্কোপ দেখা হয়। আর এই মানব আধারে অতীন্দ্রিয় ভগবদানন্দ, আত্মানন্দ লাভ; স্বরূপানুভূতির চরম প্রকাশ – অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সঙ্গে হৃদয় নিজেকে একাকার বোধ করেন। সুতরাং এই অনুভূতি এবং চরিত্র উভয়ই বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। যা হোক, ঠাকুর তখন ঐ ভাবোন্মত্ত ভাগ্নেকে ক্ষান্ত ও শান্ত করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন এবং বুঝিয়ে বলেন – "হৃদু! চেঁচাসনি, ও হৃদু! চেঁচাসনি, লোক জড় হবে।"

কে চেঁচান নি? হৃদয় তো সংসারী-বিষয়ী, সন্তানের জনক। কিন্তু যে নরেন্দ্রনাথকে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ সপ্তর্ষিলোক থেকে ধরাধামে নিয়ে এসেছিলেন, সপ্তর্ষির সেই প্রবীণতম ঋষি নরেন্দ্রকে ঠাকুর ছুঁয়ে দিতে তিনিও তো বলেছিলেন – "ওগো! আমায় একি করলে গো, আমার যে মা আছে, বাবা আছে।" শ্রীরামকৃষ্ণও তো সাধন কালে ঐ আবেশে 'দিব্যোন্মাদ', 'জ্ঞানোন্মাদ', 'প্রেমোন্মাদ' হয়েছিলেন। সাধকোত্তর জীবনেও তিনি কুঠি ঘরের ছাদে উঠে চেঁচামেচি করতেন-উচ্চ কণ্ঠে অন্তরঙ্গ ভক্তদের ডাকতেন। ব্যাকুলভাবে কাঁদতেন। ঐভাব সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই উক্তি-"হাসে, কাঁদে, নেচে গায়।"

পঞ্চভূতের খোল ভগবদ্ আবির্ভাবের আবেশ কি সংবরণ করতে পারে? সাধনকালে ঠাকুরের দেহে এমনি অত তাপ হত? যেখানে শুয়ে থাকতেন তিনি, সেখানকার মাটি-মেঝে পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠত। সেখানে জল ঢাললে গরম বাষ্প উঠত। গোস্বামী শ্রীরূপ-সনাতনের গাত্রদাহের ফলে সেখানের গাছের পাতা পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এই দেহে দিব্য আবির্ভাব ঘটলে, সীমার মাঝে অসীমের খেলা হলে চেঁচামেচি, হাসিকান্না হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু হৃদয় ঐ অবস্থায় পরিষ্কার বলেন- "মামা! তুমিও যা, আমিও তাই।"

তখন লীলাময় রামকৃষ্ণ ভাবেন, হৃদুর এই অবস্থা বজায় থাকলে তো তাঁর (ঠাকুরের নিজের) দেহধারণ করে থাকা আর সম্ভব হবে না। অবতার-লীলায় অনেক ক্রিয়াকাণ্ড এখনো বাকি আছে। অবশেষে, তিনি নিজ ধুতির

আঁচল কাঁধ থেকে নামিয়ে বেশ শক্ত করে আপনার কোমরে বাঁধেন। তারপর তিনি কঠিন বাহুপাশে হৃদয়কে জড়িয়ে ধরে বলেন – "মা! শালাকে জড় করে দে, জড় করে দে।" যিনি অন্যদের বুকে হাত বুলিয়ে বলেছেন "চৈতন্য হও। তোমরা চৈতন্য হও। তোমাদের চৈতন্য হোক," তিনিই চৈতন্যবান ভাগ্নেকে ঐ ভাবে জড় করে দেন। তখন হৃদয় সকাতরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন-"ওগো মামা! তুমি আমাকে জড় করে দিলে! আমাকে তুমি জড় করে দিলে! মামার ঐ বিসদৃশ আচরণে ইনি নিদারুণ মর্মবেদনা ও অভিমানে শুকিয়ে যান।

এখন হৃদয়ের মধ্যে যদি দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পায়, এঁর জীবনচর্চায় ও আচার-ব্যবহারে যদি অপ্রত্যাশিত বিভ্রাট উপস্থিত হয়; সেজন্য তো ঠাকুরই দায়ী। কালীয়দমন কালে সেই বিষাক্ত নাগ নারায়ণকে শুধু ছোবল দিয়েছিল ও তাঁর গায়ে বিষ ঢেলেছিল। নারায়ণ তাকে যা দিয়েছিলেন, সেই তাই ফিরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। ঠাকুরকে রামবাবু বলেছিলেন – "আপনি গিরিশকে যা দিয়েছেন, সে তাই এখন আপনাকে দিচ্ছে। সে আপনাকে খিস্তি দিচ্ছে, গালি-মন্দ করছে। আপনাকে সে মারতে বাকি রেখেছে – এই যথেষ্ট।" তখন ঠাকুর ভাবেন – 'তাই তো।' সব ব্যথা তিনি ভুলে যান এবং ব্যাকুল হয়ে ওঠেন গিরিশের জন্য। তিনি তখনই ছুটে যান তাঁর বাড়িতে – তাঁকে দেখার জন্য।

কালপুরুষের অমোঘ বিধানে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অভিন্নাত্মা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বর্জন করেছিলেন। সেই ঘটনার নিমিত্ত হয়েছিলেন মহামুনি দুর্বাসা। আর রামকৃষ্ণ -লীলায় সেই কালপুরুষেরই অলঙ্ঘ্য বিধানে চিরসহচর হৃদয়রামের বিদায়ের নিমিত্ত হন মথুরনন্দন ত্রৈলোক্য বিশ্বাস। আমাদের বোধবুদ্ধির দ্বারা এসব অসম্ভব ঘটনার গূঢ় রহস্য আমরা বুঝতে পারি না। তবে, এরূপ ক্ষেত্রে মহাজন-বাক্যই আমাদের অবলম্বন – অবতার পুরুষগণের যাবতীয় আচরণ ও উপদেশ লোকশিক্ষার জন্য, জগদ্ধিতায়।

'প্রভুর নিজের হৃদু ছোট খাট নয়।
দেব আদি সর্ব-পূজ্য বুঝিবে নিশ্চয়।।' পুঁথি

দশাবতারে বিবর্তনবাদের ইঙ্গিত

স্বামী শিবানন্দ গিরি

ইংরাজী শিক্ষিত মানুষ সব সময়ে প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিল খোঁজে। অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উঠলে বিরক্ত হন। দ্বিধাগ্রস্ত অনেক মন বিজ্ঞানের মধ্যে শাস্ত্রবাক্যের মিল খুঁজে পেলে গ্রহণ করে, অমিল হলে বর্জন করে। এর কোনটাই আমি করতে চাইছি না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, একটা দিন আসবে যেদিন বিজ্ঞান এবং দর্শন পরস্পর হাত মেলাবে। এবং সেদিন এক নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটবে যা অনাগত সমস্ত মানুষ এবং সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। আমি সেদিনের প্রতীক্ষা করছি। দর্শন চেয়েছে সত্যকে জানতে, বিজ্ঞান চেয়েছে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে। উভয় লক্ষ্য যখন এক, তখন লক্ষ্যে উপনীত হলে উভয়ে মিলতে বাধ্য। এই বিশ্বাসে নির্ভর করে রইলাম। বিজ্ঞান দিয়ে শাস্ত্রের মান রক্ষা করতে চাই না, শাস্ত্র দিয়ে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করারও বৃথা চেষ্টা করছি না।

অবতারবাদ নিয়ে কত তর্ক বিশ্বব্যাপী। সম্ভবতা, অসম্ভবতা, যৌক্তিকতা – কত লড়াই। অথচ বিবর্তনবাদ স্বীকার করতে আমাদের বাধছে না। ডারউইন কবেকার লোক? বড় জোর একশ বছর। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের আগে মানুষ জানত না মানুষের সৃষ্টি রহস্যের পেছনে একটা ক্রম বিবর্তন আছে(ডিসেন্ট অফ্ ম্যান)। কেউ বলছিল, মঙ্গলগ্রহ থেকে মানুষ ধপাস্ করে এসে পড়েছিল পৃথিবীতে। কেউ বলেছে আমরা সূর্যের সন্তান, সূর্যলোক থেকে নেমে এসেছি পৃথিবীর বুকে। প্রথম থেকে দু'ঠ্যাং দু'হাত নিয়েই। ডারউইন সাহেব দেখালেন প্রথমে শুধু জল ছিল। জলের নীচে জন্ম নিয়েছিল এক ধরণের গুল্মলতা। তাই থেকে কি করে যেন জন্ম নিল ভাসমান সাপের মত জলজন্তু। সাঁতার দিতে দিতে তারা বিভিন্ন জাতের মৎস্য জীবে রূপান্তরিত হল। তারপর দেখা দিল কাদামাটি, তারপর কঠিন মাটি। জলের বুক থেকে ঠেলে উঠল ঘাস পাতা গাছ অরণ্য। জন্মাল উভচর, জন্মাল তৃণভুক, বনচর জন্মাল, জন্মাল হিংসাশ্রয়ী অধিকতর শক্তিশালী ক্ষিপ্রগতি জন্তু।

জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র সাড়ে সাতশ' বছরের পুরোনো। বারশ' বছরের পুরোনো পুরুষোত্তমের মন্দিরে সিংদরজার মাথায় ঐ স্তবের অনুগ দশ অবতারের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। ঐ দশাবতার-চিন্তা কতদিনের পুরোনো জানিনা, কিন্তু এটি জয়দেবের কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টি নয় নিশ্চিত করে বলা যায়। মহাভারতে

চব্বিশ অবতারের কথা আছে। তাদের পারম্পর্য ও দশ অবতারের পারম্পর্য মেলেনা বটে, কিন্তু ভগবানের দশ অবতার অধিকতর ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

দশ অবতারের প্রথম অবতার মৎস্য অবতার। প্রলয় পয়োধিজলে ধৃত বানসি বেদম, কেশব মৎস্যরূপে আবির্ভূত হলেন। চণ্ডীতেও আছে মধু কৈটভ বধ করবার সময়ে নারায়ণ জগতে শুধু জলই পেয়েছিলেন। যদি শুধু জলই থাকে, তাহলে ভগবান জলজীব ছাড়া আর কী ভাবে আবির্ভূত হতে পারেন? নারায়ণও অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন জলের ওপর। কাদামাটি দেখা দিল যখন, ভগবানের দ্বিতীয় অবতার উভচর কূর্ম, যখন বন দেখা দিল তখন তিনি বনচর বরাহ। তারপর একটা মিসিং লিঙ্ক।এটা বিজ্ঞান বলতে পারছে না। গরিলা, হনুমান, বাঁদর, বনমানুষ থেকে কি করে মানুষ এল, এর মাঝে একটা স্তর খুঁজে পাচ্ছে না। পুরাণও খুঁজে পায়নি। সন্ধান পেয়েছে নৃসিংহ অবতারের। আধখানা মানুষ, আধখানা সিংহ, পুরো মানুষ হয়নি। তারপর এসেছে বামন অবতার। খর্বাকৃতি মানুষ, মানুষের পূর্ণ আবির্ভাব নয়। তারপর বনবাসী ভয়ঙ্কর-পরশুরাম। হাতে কুঠার, কাঠ কাটার যন্ত্র। বনবাসীর চিহ্ন। ব্যবহারে হিংস্র। কতবার নিঃক্ষত্রিয় করেছেন, তার বড়াই করেন। বাপের সন্দেহকে বিশ্বাস করে মা-কে বধ করেছেন। মাতৃহত্যার কলঙ্ক মাথায় নিয়ে পিতৃভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজব্যবস্থা যেন আসছে। এলেন রাম, বনচারী কিন্তু রাজা। পুরো সমাজ চেতনা। প্রজাবৎসল কিন্তু ধনুর্ধারী। ধনুর্বান শিকারীর প্রতীক। ফলাহারী মানুষ শিকার করতে শিখেছে। তারপর এলেন হলধর। কৃষির প্রতীক। শিকারী মানুষ কৃষক হল। শিখল হলকর্ষণ। জানল, শিশুর দুধ মায়ের বুকেই আছে। শুধু কর্ষণ করে মাটির বুক থেকে মানুষ তার খাদ্য খুঁজে নিতে পারে। শিকারী জীবের হিংস্রতা ভুলে মানুষ অহিংসার পথে নামল। এলেন বুদ্ধ, জ্ঞানের প্রতীক। মানুষ ঘরবাসী হল। নিজের ভাঁড়ারে জমিয়ে রাখতে শিখল। এবার তার সময় হয়েছে পেটের চিন্তার চেয়ে আরও বড় কিছু চিন্তার। এখানে মানুষ দাঁড়ি টানতে পারত। কিন্তু এর পরে আর একটি অনাগত অবতার বাকী রইলেন। তিনি অশ্বারোহী মুক্ত-অসি কল্কি। কলির প্রতীক, কালের প্রতীক, যুদ্ধের প্রতীক। লড়াই করে বাঁচতে হবে, বাঁচতে গেলে লড়তে হবে। অহিংসা রক্ষার জন্য শক্তি চাই। অহিংসা দুর্বলের ধর্ম নয়। গাণ্ডীব ফেলে দিয়ে অর্জুন ক্ষাত্রধর্ম বিসর্জন দিতে বসলে কৃষ্ণ চীৎকার করে বলেছিলেন, ক্লৈব্যং মাস্মঃ গমঃ পার্থ।

দশাবতারের সঙ্গে বিবর্তনবাদের এই যে মিল, এটা কি আকস্মিক? কাকতালীয়? যদি তাই হয়, তবে চুরাশী লক্ষ যোনি পেরিয়ে মানুষ হয়েছে,

একথা উঠেছিল কেন? শুধু তাই নয়, সেখানেও বলা আছে প্রথমে স্থাবর জঙ্গম জনিত বৃক্ষ গুল্মাদি বিশ লক্ষ জন্ম।তারপর এগার লক্ষ যোনিতে মাকড়সা, পিপীলিকা কীটপতঙ্গ জন্ম। তারপর দশ লক্ষ পক্ষি যোনিতে জন্ম। তারপর নয় লক্ষ জলচর মৎস্যরূপে জন্ম। তারপর ভূচর বন্যপশু জন্ম তিরিশ লক্ষ যোনিতে। মানুষকে আরও চার লক্ষ মনুষ্য যোনি পার হতে হয়েছে।

এই প্রাচীন কথাগুলির পেছনে কি কোনও বিজ্ঞান চিন্তা ছিল না? বিজ্ঞান তো জ্ঞানের একটা অংশমাত্র। জ্ঞানের একটা অংশকে পৃথক করে নিয়ে সে বিষয়ে বিশেষ করে বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা করলেই জন্ম নেয় নতুন বিজ্ঞানের। তাই নয় কী? বিজ্ঞান তো একটা ব্যাখ্যা মাত্র, একটা বিশ্লেষণ একটা ব্যবচ্ছেদ, একটা বিন্যাস।

অভিনয় **শ্রী সুনন্দন ঘোষ**

অভিনয়ে কেটে গেল ভোর থেকে রাত।
কত যে ভূমিকা!
কখনো বিদূষক, কখনো খলনায়ক, কখনো নগণ্য দর্শক।
টানা – পোড়েন ---- টানা – পোড়েন ----
রাত-জ্বলা মোমের মত ছোট হয়ে আসে জীবনের মাপ।

অবসর ছিল না তখন।
একটানা অভিনয়ের ফাঁকে
নিজের কথা বলার অবসর ছিল না,
অবসর ছিল না নিভে আসা সূর্যের দিকে তাকাবার,
আকাশ ভেঙে নেমে আসা বৃষ্টিতে ভিজে
মুঠো মুঠো শিল কুড়োনোর,
সহগামী রমণীর আলিঙ্গনে হৃদয়ের উষ্ণতা খোঁজার।

DO NOT COPY

কি করে যেন বদলে গেল দৃশ্যপট।
আমাদের এপার্টমেন্টের এক জোয়ান ছেলে
বাড়ি থেকে বেরোলো স্কুটি নিয়ে।
ফিরল না।
কাঁচের গাড়িতে তার পা দুটো হাতে ধরে
নির্বাক দাঁড়িয়েছিল তরুণী স্ত্রী।
নিথর শুয়ে থাকা তাগড়া ছেলেটা আমার
মাথার কোণে কোণে উঁকি দিয়ে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো ...
"এখনও এত সুখ অভিনয়ে?"

এবার নিজের কাছে ছুটি চাওয়ার পালা।
নিজেকে খুঁজে পাওয়ার বিরাম।
শিথিল স্নায়ু, বিপন্ন শরীর,
তবু ডান পা রাখলাম দরজার বাইরে।

আমার সামনে হেঁটে চলেছেন শ্রী জ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর।
অরুণাচলে সূর্যোদয়, দ্বারকায় সূর্যাস্ত,
গুলমার্গের গণ্ডোলা, জয়শলমীরে উটের সিল্যুয়েট ---
টুকরো টুকরো মুহূর্ত সাজিয়ে রাখছি জীবনের এলবামে।

অনেক হারানোর পরেও অনেক প্রাপ্তি থেকে যায় ...
চিরন্তন অবসরের আগে।

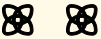

DO NOT COPY